সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে কী পেলাম

স্বপন বসু

গত দু-আড়াই বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে চূড়ান্ত অস্থিরত বাড়ছে। রাজনৈতিক দলাদলি সামাজিক জীবনকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে তুলেছে। যার ফলে রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় মানুষে-মানুষে বিভেদ, হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি স্বাধীনোত্তর কালে এই প্রথম চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে মানুষের মধ্যে 'আমরা' আর 'ওরা'— এই বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু গ্রামে নয়, শহুরে জীবনেও এই দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে আমাদের দিন কাটছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেই শিল্পায়ন নিয়ে অতিরিক্ত মাতামাতি সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজে একটা সংঘর্ষমূলক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সরকারের শিল্পায়ন নীতির ফলে গ্রামের কৃষিজীবী, মৎস্যজীবী, সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছে। দেশী-বিদেশী শিল্পপতিদের শর্তে তাঁদের পছন্দ করা জমিতে শিল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অতি উর্বর তিন-চার ফসলি কৃষিজমি হলেও রেহাই নেই। কোনো বিরোধিতাকেই আমল দেওয়া হবে না। এই নীতি রূপায়ণেই পুলিশ-প্রশাসন এবং প্রয়োজন হলে দলীয় কর্মীদের সাহায্য নিয়েও প্রতিবাদী কৃষকদের মোকাবিলা করা হবে। এবং ঠিক তা-ই করা হয়েছে হুগলি জেলার সিঙ্গুর ব্লকের প্রায় এক হাজার একর অতি উর্বর কৃষিজমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে। ১৮৯৪ সালের সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের জমি অধিগ্রহণ আইনের সাহায্যে জমি অধিগ্রহণ করে টাটা গোষ্ঠীকে ছোটো মোটরগাড়ি তৈরি করার কারখানা গড়ে তোলার জন্য দেওয়া হয়েছে। এর পরেই পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে প্রায় ১৪ হাজার একর জমি বিদেশী শিল্পপতি সালিম গোষ্ঠীর 'কেমিক্যাল হাব' গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করা হল। এই বিজ্ঞপ্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নন্দীগ্রামের মানুষ সিঙ্গুরের পরিণতি দেখে জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধে ফুঁসে উঠলেন। এ-দুটিই সাম্প্রতিক অতীতের ঘটনা। সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে শুধু এরাজ্যের মানুষই নন, সারা দেশের, এমনকী বিদেশেরও বহু মানুষ তা প্রত্যক্ষ করেছেন। ওই দুটি স্থানে যে ধরনের পাশবিক অত্যাচার-নিপীড়ন হয়েছে তা নিয়ে দেশের সঙ্গে বিদেশের বহু মানুষও প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। তার পর জল অনেক দূর গড়িয়েছে। মানুষের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ফলে সিঙ্গুর থেকে টাটা গোষ্ঠী হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। নন্দীগ্রামের জমি অধিগ্রহণের 'বিজ্ঞপ্তি' প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। দুটি ঘটনাই মহামান্য আদালতের বিচার্য বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। বিচারপর্ব শুরু হয়েছে। এই নিবন্ধটি প্রকাশের পূর্বেই সিঙ্গুরের একটি পাশবিক হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় ঘোষণাও হয়ে যাবে।

সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের ঘটনায় বাংলার সর্বত্র, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজের মানুষ আজ সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের লড়াই থেকে শিক্ষা নিয়ে তারা সরকারের জনবিরোধী জমি অধিগ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে 'আমরা' আর 'ওরা' ব্যবধান ঘুচিয়ে জোট বেঁধে রুখে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রকৃত জনস্বার্থে রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় বা হাসপাতাল তৈরির জন্যও জমি অধিগ্রহণ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এই বিস্ফোরক অবস্থার মধ্যে গ্রাম-শহর নির্বিশেষে বাংলার সমাজ জীবনে একটা নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয়েছে, যা গণতন্ত্রের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে শুভ ফলদায়ী হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এরাজ্যে আন্দোলন কিছু কম হয় নি। উদ্বাস্তু

পুনর্বাসন, খাদ্য, যানবাহনের ভাড়া, বিহার-পশ্চিমবঙ্গের সংযুক্তি নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেক হিংসাশ্রয়ী আন্দোলন এরাজ্যে হয়েছে। ট্রাম-বাস পুড়েছে, সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে। বহু মানুষের মৃত্যু, কারাদণ্ড ভোগ সবই হয়েছে। কিন্তু সব আন্দোলনই হয়েছে কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দলের উদ্‌যোগে। এক্ষেত্রে অগ্রণীর ভূমিকা ছিল বামপন্থীদের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির। এই-সব আন্দোলন সংগঠিত করেই মার্কসবাদী ভাবাপন্ন দলগুলি সুসংহত শক্তিশালী রাজনৈতিক দলরূপে গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও হতাহত হয়েছেন। অশেষ নিপীড়নের শিকার হয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু উদ্‌যোগটা রাজনৈতিক দলগুলিই নিয়েছে। 'জনস্বার্থে' আন্দোলন হলেও আপামর সাধারণ মানুষ এর থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। এই প্রথম সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে দেখা গেল কোনো রাজনৈতিক দল নয়, সাধারণ মানুষ বে-ঘর, বে-রোজগার হওয়ার আতঙ্কে প্রতিরোধের আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন, নিজেরা জোটবদ্ধ হয়েছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এসেছে অনেক পরে। এটাই বাংলার আন্দোলনের ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায়। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে অভিনব সংযোজন। শোষিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত হতে হতে সমাজের নীচের তলার এই অতিনিরীহ সাধারণ মানুষ নিজেরাই আত্মরক্ষায় এগিয়ে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্ধকারময় রাজনৈতিক অরাজকতার মধ্যে একটা নতুন আশার আলো সৃষ্টি করেছেন। সমাজের নীচের তলার মানুষ আজ জেগেছেন। রাজনৈতিক দলগুলো আর যেমন-তেমন বুঝিয়ে কার্যোদ্ধার করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হয়। স্বাধীনতাপূর্বকালে আমাদের সমাজে সজ্জন শিক্ষিত বা সমাজপতিদের একটা সামাজিক মান্যতা ছিল। স্থানীয় নানা সমস্যায় শালিশীর ক্ষেত্রে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যেত। স্বাধীনতার পরে রাজনৈতিক দলের আঞ্চলিক নেতৃত্বের দাপটে এই সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের ভূমিকা ক্রমেই গৌণ হয়ে পড়ল। গত তিন দশকে বামফ্রন্ট শাসনে গ্রাম-শহরের সর্বত্র এই সুশীল সমাজ সম্পূর্ণভাবে একান্তে সরে গেছেন। রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষণায় এক 'খয়ের খাঁ' শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যাদের কোনোভাবেই নিরপেক্ষ বলা যায় না। কারণ রাজনৈতিক দলের কৃপাপ্রার্থী হয়েই তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃত নিরপেক্ষ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা একটা উদাসীন নীরবতার আড়ালে নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকেছেন। গত তিন দশকে মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু নিধন, বিজনসেতুর উপর প্রকাশ্য দিবালোকে সতেরজন আনন্দমার্গীকে পুড়িয়ে মারা, কেশপুর, সূচপুর, গড়বেতা, ছোটো আঙারিয়া, ধানতলা, বানতলা— এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু প্রকৃত দলনিরপেক্ষ শিক্ষিত সজ্জন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহসী হন নি।

এই প্রথম সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের দীর্ঘ নীরবতার অবসান ঘটল। প্রতিবাদে তাঁরা ফুঁসে উঠলেন। মিটিং-মিছিলে তাঁরা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব হলেন। তাঁদের আহ্বানে কলকাতার বুকে লক্ষ মানুষের ধিক্কার মিছিল হল। বাঙালি সমাজ তার দীর্ঘদিনের হারানো প্রতিবাদের ভাষা ফিরে পেল।

এই সুশীল সমাজই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে মুসলিম যুবক রিজওয়ানুর রহমানের পুলিশী প্ররোচনায় অস্বাভাবিক মৃত্যু, কবি-সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনের বহিষ্কারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে সোচ্চার হয়েছেন। সম্পূর্ণ দলীয় রাজনীতি-বর্জিত মঞ্চ তৈরি করে তাঁরা অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিরন্তর প্রতিবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এটা সমকালীন বঙ্গ সমাজে রাজনৈতিক অমানিশার মধ্যে আর-একটি আলোর শিখা, যা নিশ্চিতভাবেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাথা উঁচু করে মানুষের মতো বাঁচার পথ দেখাবে।

বামফ্রন্ট সরকার প্রতিবাদী মানুষদের শিল্পায়ন-বিরোধীরূপে ধিকৃত করতে চেয়েছেন। কিন্তু পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে জিন্দাল গোষ্ঠীর ইস্পাত প্রকল্প

রূপায়ণে এই প্রতিবাদী মানুষরাই সর্বাত্মক সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। সেখানে সরকার মধ্যস্থতার ভূমিকা নিয়ে কৃষকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ পান নি। জিন্দাল গোষ্ঠী সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। জমির সঠিক মূল্য দিয়েছেন। জমিদাতা কৃষকদের কারখানার শেয়ার বিতরণ করে তাদের অংশীদার হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তাই সেখানকার একফসলি কৃষিজমির মালিকরা সোৎসাহে জিন্দাল গোষ্ঠীর ইস্পাত প্রকল্প রূপায়ণে হাত মিলিয়েছেন। কারণ তাঁরাও শিল্প চান। কিন্তু সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের অতি উর্বর কৃষিজমি ধ্বংস করে হাজার হাজার কৃষককে নিঃস্ব করে সরকার সন্ত্রাসের দ্বারা জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়েই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন। কাজেই ব্যর্থতার দায় সরকারের উপরেই বর্তায়। অবশেষে সরকারকে স্বীকার করতে হয়েছে, 'সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণে ভুল হয়েছিল, কাজেই ভবিষ্যতে কৃষকদের সম্মতি নিয়েই জমি অধিগ্রহণ করা হবে।' প্রতিবাদী সংগ্রামী কৃষকদের এখানেই জয় হয়েছে। সিঙ্গুরের সমস্যা এখনো পুরোপুরি মেটেনি। সরকারকে বুঝতে হবে, কৃষকদের ন্যায্য দাবি মেনে নিয়েই সেখানে শিল্প গড়া সম্ভব, নচেৎ নয়। সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হোক, বাংলার মানুষ আজ এটাই চান।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, লড়াই করেই অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়। লড়াই করেই অধিকার রক্ষা করতে হয়। আমরা সাম্প্রতিক অতীতে এই প্রতিবাদের ভাষা ভুলে গিয়েছিলাম। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আমাদের সেটা ফিরিয়ে দিল। দ্বিতীয় শিক্ষা হল, লড়াইয়ের ময়দানে আমরা সবাই এক। মতাদর্শগত, ধর্মীয় কোনো বিভেদ আমরা মানব না। আমরা ঐক্যবদ্ধ হব। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের এই শিক্ষা নিয়েই সমকালীন বঙ্গসমাজ মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখবে।

গান্ধী-সুভাষ সংঘাত (গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপ) ২০.০০

সুনীল দাস প্রণীত

যুগনায়ক সুভাষচন্দ্র ২৫.০০

সমর গুহ প্রণীত

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্র ২০.০০

জয়শ্রী প্রকাশন।। ১৮-এ টেমার লেন, কলকাতা ৯

এ ছাড়া প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, কলকাতা ৯,

প্রোগ্রেসিভ বুক স্টল (রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড সংযোগস্থল)